POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

फरवरी, 2021

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लगभग 750 शब्दों में दीजिए ।*

1. बांग्ला-हिन्दी अनुवाद में मातृभाषा का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ? इसके कारण होने वाली भूलों से कैसे बचा जा सकता है ? समझाइए । *20*

अथवा

प्रशासनिक तथा तकनीकी सामग्री का अनुवाद करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है ? स्पष्ट कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

কর্মখালি, স্বনির্ভর, বাসিন্দা, মক্কেল, পরিবর্তন, পরিছন্ন, বয়স, ভাগ, সকল, ব্যাপার

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

व्यवधान, आँधी, समाचार, भूख, आरामदेह, बरसात, व्यवहार, भोजन, सुविधा, आँख

4. निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं ***पाँच*** का बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला में अलग-अलग प्रयोग कर वाक्य बनाइए : *20*

संपर्क, अभ्यास, राग, व्यंग्य, भावना, अनुभव, आयु, तटस्थ, संदेश, अर्थ

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***चार*** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *4×10=40*

(a) দীর্ঘ আলোচনার শেষে নবকুমার উঠে পড়েছেন । তিনি বুঝেছেন, এই কেসটায় দীর্ঘ সময় ধরে ভাবনাচিন্তার সময় নেই । অর্জুন ভাটনগর অবশ্য ওবেরয় রুম ছেড়ে উঠলেন না । বোঝাই যাচ্ছে, আরও কাজকর্ম এখানে বসেই সারবেন । আজকাল ট্যুরিং কোম্পানিকর্তারা একই কোপে অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলতে চান, কারণ সময় অল্প, দায়িত্ব অনেক এবং ভ্রমণের আকাশচুম্বী । নবকুমার দেখেছেন একই সিটিং-এ উপরমহলের এগজিকিউটিভরা কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, আধঘণ্টা পরে নতুন কাউকে ব্রেকফাস্ট অথবা লাঞ্চ টেবিলে ইন্টারভিউ করছেন একই পদের জন্যে । মানুষকে তাড়ানো আজকাল সহজ হয়ে গিয়েছে, রাস্তা থেকে নিয়ে যাওয়া রাজমিস্ত্রি অথবা ছুতোরদের মতন দিনের শেষে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিলেই আর

পরের দিনের কথা ভাবতে হয় না । কিন্তু নতুন কাউকে অন্য কোথা থেকে ছাড়িয়ে আনা শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠেছে । এর জন্যে ভাড়া করো হেড হান্টার — যারা আসলে শিকারি । কেমন মুড়ো প্রয়োজন তা জানালে, ছ'মাসের মাইনের পরিবর্তে এরা লোকের সন্ধান করে দেবে । যত মানুষের চাকরি যায় ততই এজেন্টদের ভাল, কারণ আবার লোক খোঁজো । এই অশান্ত শতাব্দীতে মানুষ আরও চঞ্চল হয়ে উঠবে — দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বলে বোধহয় কিছুই থাকবে না ।

অর্জুন ভাটনগর বলেছিলেন, "অনিত্য এই সংসারে নিত্যকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে ইন্ডিয়া যথেষ্ট ভুল করেছে ।"

"চিনারাও এক সময় তাই করেছে, মিস্টার ভাটনগর ।"

অর্জুন উত্তর দিয়েছেন, "সেটা ওয়ান্স আপন এ টাইম । এখন দীর্ঘস্থায়ীত্বটা কোনও গুরুত্ব পাচ্ছে না চিনে । গতকাল নয়, আগামী কাল নয়, সব গুরুত্বটাই আজকে । টুডে ! বাবার কাছে শুনেছি, এই কলকাতায় একসময় ইন্ডিয়া টুমরো বলে একটা কাগজ রমরম করে চলত, তারপর উঠে গেল । এখন ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার জয়জয়কার ।"

(b) সাত দিনে একটা দেশ চেনা যায় না, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে একটি কড়ে আঙুলের মতো দেখতে সেই দেশ লম্বালম্বি ছ' ঘন্টায় আর আড়াআড়ি দেড় ঘন্টায় এ পার ও পার করে ফেলা গেলেও । সাত দিনে কিছু ছবি থেকে যায় । কালক্রমে অনেক ছবি ঝাপসা হয়ে আসে । দু' চারটি থেকে যায় । এখন, ইজরায়েলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসার দেড় বছর পরে দু'দণ্ড চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে ছবিগুলো, খুঁজতে গিয়ে দেখি, সবার আগে মনে পড়ছে একটি মালগাড়ির কামরার কথা । জেরুসালেমে এক ছোট পাহাড় । পাহাড় না বলে টিলা বসলেও চলে । তার নাম হর হাজিকারোন । আর একটি নামও আছে — স্মৃতির পাহাড় । সেই উঁচুতে উঠে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই চোখে পড়ে ফিকে গোলাপি রঙের কামরাটি । সামনে এক রেল্‌লাইন চলে গেছে আপনমনে, চলে গেছে পাহাড়ের কিনারা অবধি, তার পরেই হঠাৎ অনেকখানি ঝাঁপ দিয়ে নীচে এক গভীর উপত্যকা । যেখানে দু' সারি লোহার পাত থমকে গেছে, ঠিক সেইখানে, রেলপথের শেষে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ কামরা । বন্ধ, কিন্তু তার দেওয়ালে দু' জায়গায় দু' ফালি গবাক্ষ, হাওয়া চলাচল করতে পারে, দু' এক পশলা আলোও । আলো না হলেও চলত, কিন্তু হাওয়া চলাচল করার দরকার ছিল । না হলে কামরার মধ্যে অতগুলো মানুষ অতটা পথ বাঁচবে কী করে ?

মানুষ ? মালগুড়ির কামরায় ? আমাদের প্রবীণ দিশারি বললেন, "এই রেললাইন, আর কামরা, এর নাম 'মেমোরিয়াল টু দ্য ডিপোর্টিজ' ।" ডিপোর্টিজ, যাদের চালান দেওয়া হত । লহমায় বুঝতে পারলাম কথাটির অর্থ, ওই রেললাইনের অর্থ, ওই ফিকে গোলাপি মালগাড়ির, ওই গবাক্ষের । আর বুঝতে পেরে নিজের অজান্তেই বারেক চোখ বুজে ফেললাম, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল ।

(c) মুন্নি ।। দারুণ । সব সেই র‍্যাশনব্যাগের খেলা । কে আগে ট্রামলাইন ধরে ছুটতে পারে । [লতিকার হাত ধরে] – কুইক ! কুইক ! মাসি, নার্সিংগহোম...

[দ্রুত মুন্নিদের ঘরের আলো ছুটে গিয়ে পড়ে নার্সিংগহোমের কেবিনে — যেখানে ধৃতিকান্ত ঘোষাল গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে । নার্সিংহোমের মালিক বৃদ্ধ হালদারমশাই কাগজপত্র এক্স-রে প্লেট নিয়ে ব্যস্তভাবে ঢোকে ।]

হালদার ।। সব্বোনাশ । বসে রয়েছেন স্যার । শুয়ে পড়ুন । আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে আমার নার্সিংহোমের বদনাম হয়ে যাবে স্যার ।

ধৃতিকান্ত ।। [গোলাপটি শুঁকে] হালদার মশাই, আমি তো শুয়ে থাকতে আপনার এখানে আসিনি । রিসেপশানে বলে রাখুন কোনও সুন্দরী মহিলা... হাসিমাখা মুখ... এখনই আসবে... সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয় যেন...

হালদার ।। সরি স্যার, হাসিমাখা কান্নামাখা কোনও ভিজিটারই অ্যালাউ করতে পারব না । আপনার ক্লিনিকাল রিপোর্ট এসে গেছে । এখুনি স্যালাইন অক্সিজেন চালু হবে ।

ধৃতিকান্ত ।। কীসের স্যালাইন অক্সিজেন । আমার কি কোনও প্রব্লেম আছে ? অ্যাডমিশান নিলে কিছু চেকাপ-টেকাপ করাতে হয়... নইলে আপনাদের বিল মোটা হয় না... তাই করা । আরে মশাই, আর কোন্ পেশেন্টর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন ।

[হালদার রিপোর্টপত্র এক্সরে প্লেট পরীক্ষা করছে ।]

হালদার ।। আজ্ঞে না । এইতো স্যার, আপনার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ... তার চেয়ে খারাপ লাংগস... গলব্লাডার সবচেয়ে খারাপ... আর কিডনির কথা না বলাই ভাল ।

ধৃতিকান্ত ।। কী হচ্ছে কি, অ্যাঁ, ওসব কী দেখা হচ্ছে ? নার্সিংহোম খুলেছেন বলে ডাক্তারির সব বুঝে গেছেন । হালদার মশাই সেদিনও মশলার ব্যবসা করতেন খবর রাখি না ভেবেছেন ।

হালদার ।। [বিনীতভাবে] আজ্ঞে মশলাপাতির যতটা বুঝতাম, নার্সিংহোমের লাইনে এসে ডাক্তারিরও ঠিক ততটাই বুঝি স্যার । ঘাঁতঘোঁত না জেনে যে ব্যবসা চলে না... আপনাকে তা কি বলে বোঝাতে হবে স্যার ? ...দয়া করে পা নাচাবেন না । গোলাপটাও রাখুন । আধঘণ্টা পরে আপনার অ্যাপেনডিকস অপারেশান ।

(d) এরপর থেকেই অনুপমের জীবনে সবটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । হরিগ্রাম ফিরেই সুভাষকাকা একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন । সুন্দর ছোট বাড়ি । গেট ঠেলে ঢুকলে সামনে ছোট একটু ঘাস জমি । গ্রিল ঘেরা বারান্দা । তিনটে ঘর । বললেন, এই বাড়িতে তোমাদের পাকাপাকি থাকার বন্দোবস্ত করছি । কিছু ভেবো না বাবা অনুপম । তুমি এখান থেকেই তোমার এম.এ. পড়াটা চালাতে পারবে । তারপর দেখা যাবে, আমি তো আছিই ।

অনুপম এখনও পর্যন্ত কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারেনি । কী করে কী হয়ে গেল । শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ির মেজ মেয়ে যে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে — এ জন্য সুভাষকাকার বাড়িতে ক্ষোভ ক্রমশ পাকিয়ে উঠছে তখন । সুভাষকাকার স্ত্রী, নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরেও এ জন্য অশান্তি করলেন । মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলা হল । এসবই অনুপম একটু একটু করে জানতে পারে ।

অনুপম কেবল ভাবছে বাবার কথা । ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বাবা, গাড়ির সামনের মাঠের পাশ দিয়ে তাদের গাড়িটা চলে আসছে । দু তিন দিন পরে বাবা একবার এসে ঘুরে গেল । চোখ আরও বসে গেছে । মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি । অনুপম বলল, থাকো না বাবা । থেকে যাও । কত জায়গা তো বাড়িতে । বাবা বলল, না, তোর নতুন মা রাগ করবে । যাই ।

অনুপম বলল, তোমাকে খুব বকছে বুঝি । বাবার ফোকলা হাসি দেখল অনুপম । তেমন কিছু না । তবে তুই থাকিস না তো । তাই একটু মন কেমন করে ।

আমি তবে তোমার কাছে যাই বাবা । তোমার সঙ্গে চলে যাই চলো ।

বাবা ব্যস্ত হয় — না না, দরকার নেই । তুই এখানে থাক । এখানে থাক । সুভাষ আবার বলেছে, তোদের কোনও অসুবিধে থাকবে না ।

বাবা চুপ করে রইল একটু । তারপর বলল, তোর ওই বইটা আমি দেখি, জানিস ।

কী বই বাবা ।

(e) মহাশ্বেতার দিনটাই শুরু হল খুব এলোমেলো ভাবে । সকালে উঠেই মনীষা বেরিয়ে গেল হুট করে । ক'দিন থেকেই ঘ্যান ঘ্যান করছিল, ওর 'ভাল্লাগছে না' শুনলেই মহাশ্বেতার হৃৎকম্প হয় । সাতসকালে বন্ধুর ফোন আসার পর যখন সোল্লাসে ঘোষণা করল — মা, আমি বিতানের সঙ্গে রানীডিহি যাচ্ছি, মহাশ্বেতা ওর উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন । তারপর বললেন, — ওমা সে কী রে, এ রকম হুট করে কেউ যায় ।

কথাটার মধ্যে আদৌ কোনও নিষেধ ফুটে উঠল কি না, সেটা তিনি নিজেও ঠিক বুঝতে পারলেন না । ফুটে উঠলেও, সেটা অত্যন্ত দুর্বল । আর হুট

করে কেউ যায় না বলে মনীষাও যাবে না এমন কোনও কথা নেই । বরং মনীষার বেশির ভাগ কাজকর্মের এটাই ধারা । ওকে কখন কোথায় বারণ করে কোনও লাভ হয় না সেটাও তিনি জানেন । কাজেই মৃদু চিন্তিত স্বরে বললেন, — জায়গাটা কোথায় কত দুরে আমি তো কিছুই জানি না, আজ ফিরবি তো ।

— না মনে হয় । ও বলেছিল দুর আছে । চিন্তা কোর না মা, আজ নয় তো কাল নয় তো পরশু আমি বিতানের সঙ্গেই ফিরে আসব ।

হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল মনীষা । তখন আটটা বেজে গেছে । মানস অপর্ণার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ । এত তাড়াতাড়ি ওরা কেউ ওঠে না ।

রান্নার মেয়ের সঙ্গে রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মহাশ্বেতা । সাড়ে আটটা নাগাদ মানস উঠল । সে সাড়ে নটায় বেরোয় । সকালের এই সময়টা মহাশ্বেতা রান্নাঘরে হিমশিম খেয়ে যান । রান্নার মেয়েটা অল্পবয়সি, সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে পেরে ওঠে না । ওরই মধ্যে দুধওয়ালা আসে, পাঁউরুটিওয়ালা আসে, সে সব মহাশ্বেতাকেই নিতে হয় । অপর্ণা একবারও বেরোয় না ঘর থেকে । মানসকে খেতে দিয়ে তবে চা খাওয়ার সময় পান মহাশ্বেতা ।

(f) সবাই বলত, ছেলেটা মার খেতে পারে বটে ! এমন কিছু বলবান শরীরও নয়, দোহারা লম্বাটে চেহারা, শকুনের মতন কাঁধ দুটো একটু উচুঁ হয়ে থাকে, গায়ের রং শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি-আসন্ন মেঘ যেমন । চড়-থাপ্পড়, লাথি-ঘুসি, এমনকি বাঁশ পেটা খেলেও সে টু শব্দ করে না । মার খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গেলে এক সময় মনে হয় বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু একটু পরেই সে উঠে দাঁড়ায় । যেন কিছুই হয়নি । কতবার তার মাথা ফেটেছে, একবার ডান হাতে চুনা পাথরের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে থাকতে হয়েছে দু'মাস । তবু যে সে প্রাণে মরেনি, এটাই বড় বিস্ময়ের ।

এই মারধর সহা করার ক্ষমতার জনাই বংশীর নাম প্রথমে অনেকে জানতে পারে । একবার মাটিগাড়ায় সেই যে তিনটি ডাকাত ধরা পড়ল, পাঁচজনের মধ্যে দুটি পালাল, আর তিনটি, মারতে মারতে তাদের মেরেই ফেলা হল । সেই কাহিনী নানান আঙ্গিকে পল্লবিত হতে লাগল বেশ কয়েক দিন, তার মধ্যে একজন বলেছিল, 'ওই ডাকাতদের মধ্যে বংশীটা যদি থাকত, তাহলে কিন্তু কিছুই হত না, আবার গায়ে ফুঁ দিয়ে উঠে দাঁড়াত ।

যারা তখনও নাম শোনেনি, তারা জিজ্ঞেস করত, কে বংশী ? অন্য কেউ উত্তর দিত, ওই যে কুচিলাপাড়ার বংশী নামে ছোঁড়াটা । ওর সারা গা নিয়ে রক্ত ঝরলেও কেউ কখনও এক ফোঁটা চোখের জল ফলতে দেখেনি ।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन गरमी की दोपहर में सुनाई थी जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके, सिर के नीचे भीगा तौलिया रखे चुपचाप लेटे थे । प्रकाश और ओंकार ताश के पत्ते बाँट रहे थे और मैं अपनी आदत के अनुसार कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था । माणिक ने मेरी किताब छीन कर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, 'यह लड़का बिलकुल निकम्मा निकलेगा । मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की कहानियाँ पढ़ता है । छि:, बोल कितनी कहानियाँ सुनेगा ।' सभी उठ बैठे और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे । अंत में माणिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई जिसमें उनके कथनानुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमय, आध्यात्मिक या सर्वथा वैयक्तिक भावना न होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है । अतः समाज, व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक-संगठन और वर्ग-संबंध पर स्थापित है ।

नियमानुसार पहले उन्होंने कहानी का शीर्षक बताया : 'नमक की अदायगी' । इस शीर्षक पर उपन्यास-सम्राट प्रेमचंद के 'नमक का दारोगा' का काफी प्रभाव मालूम पड़ता था, परंतु कथावस्तु सर्वथा मौलिक थी ।

(b) सन् 1958 के आरंभ में मेरे केरल जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति आई । इस लंबे समय के कितनी बार कितनी दिशाओं से क्या-क्या अवरोध आए, अपने में यह भी एक वर्णनीय विषय है; पर इस समय मुझे उनके वर्णन

का लोभ संवरण करना पड़ेगा अन्यथा एक निबंध के स्थान पर दो निबंध तैयार करने होंगे, जिसके लिए यहाँ समय नहीं है । शायद इतना संकेत कर देने से काम चल जाए कि केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच चलने वाली लंबी लिखा-पढ़ी और किसी भी अवसर पर दोनों के बीच मेरे केरल पहुँचने की तिथि पर मतैक्य का न हो पाना, हमारे संकल्पित प्रयाण में रुकावटें डाल रहे थे । इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हो जाने से मेरे प्रस्थान की संभावना और दूर चली गई और मैं करीब-करीब निराश ही हो गया था । इतने में सहसा दिल्ली और त्रिवेंद्रम से एक साथ दो पत्र मिले जिनमें 16 अगस्त, सन् 1959 को मुझे केरल पहुँच ही जाना है, इसकी सूचना थी । यह सूचना अपनी शब्दावली में आदेश के इतने निकट थी कि मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे अमान्य कर देने की हुई । विचित्रता यह थी कि 16 को त्रिवेंद्रम पहुँचने का आदेश देने वाले पत्र मुझे उक्त तिथि से केवल दो या तीन दिन पहले मिले थे । इतना भी समय न था कि लंबी यात्रा संबंधी आनुषंगिक व्यय का द्रव्य भी दिल्ली से नहीं आया था, फिर मैं किस बूते पर जाने का साहस करता । इतनी असंगतियों के रहते हुए भी उनके प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार नहीं किया, इसे भी मैं अपनी भलमनसाहत ही कहूँगा । मैंने दिल्ली से दस-बारह दिन की मोहलत माँगी और 27 अगस्त को केरल पहुँचने का इरादा प्रकट किया । मेरे इस पत्र पर पहली बार दोनों पक्षों – दिल्ली और त्रिवेंद्रम – का अनुमोदन प्राप्त हुआ और मैंने संतोष की गहरी साँस ली ।